নির্দোষ

সায়ন্তনী নাগ

সৌমিতাকে চুপচাপ থাকতে দেখলে ভালো লাগে না। অফিসে ঢুকে থেকে অন্যমনস্ক দেখছি।

—'কি রে, কিছু গন্ডগোল নাকি?'

সাড়া নেই।

—'বল, কী হল তোর?'

—'অ্যা! কই কিছু না তো!'

কিছু তো বটেই, বলবে না সে আলাদা কথা। আর বেশিক্ষণ ওর দিকে মন দিলে চলবে না। একবার লগ-ইন করলে অবিরাম কাজের স্রোত ঢুকতে থাকবে কম্পিউটারে। তার মধ্যে সময় কোথায় পাশের কিউবিকলে নজর দেবার?

বেলা চারটে নাগাদ শেষ মেইল-টা হেড অফিসে ফরওয়ার্ড করে একটা হাই তুলেছি, খেয়াল হল সৌমিতা সীটে নেই। উঠে এসে ক্যান্টিনে ঢুকি। ক্যান্টিন নামটা শুনতে যত গালভরা, ব্যাপারটা তা নয়। সিঁড়ির নীচে একটা কফি মেশিন বসানো আচে, এই পর্যন্ত। আর দুটো বেঞ্চি পাতা। সেখানে বসে যারা বাড়ি থেকে টিফিন আনে, তারা খায়। সে সংখ্যাটা কমই। সদ্যবিবাহিত শৌভিকদা, স্বাস্থ্য সচেতন অরূপ, বনগাঁ থেকে আসা বিল্বদল... এমন কয়েকজন আর কি! সবাই প্রায় বেরিয়ে যায়। সামনের পার্কটার ধারে দোকানগুলোয় ধোসা-ইডলি, পাঁউরুটি-অমলেট এমনকি মাছ-ভাতও পাওয়া যায়। বিকেলের শিফ্‌ট -এর সবাই যদি ক্যান্টিনে কফি খেতে আসে, দাঁড়াবার জায়গা হবে না। আসলে এটা তো আর অফিসবাড়ি নয়, মিস্টার খুরানার একতলা ফ্ল্যাট আর লাগোয়া পার্কিং। তাতে কোনোরকমে কিউবিকল করে কম্পিউটার গুঁজে রমরমিয়ে চলছে অফিস। অনিন্দ্যর ভাষায়—ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন অব স্পেস।'

সৌমিতা ক্যান্টিনের বেঞ্চির কোণে এক কাপ কফি নিয়ে বসে আছে। আমিও ওর পাশে গিয়ে বসি।

—'কী হয়েছে বলা যাবে না বুঝি?'

—তোকে বলা যাবে না কেন!'

তা অবশ্য ঠিক। কোন কথাটা বলে না ও? স্কুলে থাকতে সৌমিতা ছিল ঝকঝকে মেয়ে। পড়াশোনা, নাচ-গান, আঁকা সবেতে চৌকস। দিদিমণিদের চোখের মণি। আর আমি চিরকালিন মুখচোর, ব্যাকবেঞ্চার। ক্লাস ট্রেনের পর তেমন সুবিধের রেজাল্ট হয়নি বলে নিজের স্কুলে জায়গা পেলাম না। যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল। সাত ঘাটের জল খেতে খেতে আমি যখন এই অফিসে এসে জয়েন করলাম, ভীষণ অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম সৌমিতাকে। আমারই পাশের টেবিলে আমারই মতো ঘাড় গুঁজে কাজ করছে, আমারই মাপের খাম বাগে পুরছে মসের শেষে। স্কুলে ওর সঙ্গে তেমন বন্ধুত্ব না থাকলেও অফিসে এসে সৌমিতাই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে গেল। ওর কাছেই শুনলাম মিস্টার খুরানার চেয়ে মিস্টার সেন অনেক বেশি গম্ভীর হলেও কম বিপজ্জনক। জানলাম, সকালে শিফ্‌টের নন্দিতাদি আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিকেলে অমিতেশদার শিফ্‌টে আসতে পারছে না। অ্যাকাউন্ট্যান্ট ঘোষদা অকর্মার ধাড়ি, প্রতিমাসে ইনসেনটিভ ক্যালকুলেশনে ভুল করে...ইত্যাদি, প্রভৃতি।

এ মুহূর্তে ক্যান্টিন একদম খালি, এখনও টিফিন টাইম শুরু হয়নি।

—'বল, কী হয়েছে?'

—'আজ অর্কর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

আমার হাতের কাপ থেকে কপি একটু ছলকে গেল। যাক বাবা, গায়ে পড়েনি, মেঝেতেই পড়েছে।

—'সে কি, কোথায়'

—'ওই জি-ব্লকের টেলারিং শপে ব্লাউজটা আনতে গেছিলাম, ওখানে।'

—'তারপর? কথা বললি?'

—'হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করছিল কেমন আছি, কোথায় যাচ্ছি...এসব।'

—'তুই বললি?'

—'কী অদ্ভুত, জানিস শ্রীময়ী, ও দেখলাম জানে আমার অফিস কোনখানে। কী করে জানল বল তো? এখনও কি আমার খোঁজ রাখে নাকি?'

অর্কর সঙ্গে সৌমিতার প্রেমটা শুরু হয়েছিল স্কুলে থাকতেই। জানতাম আমরা ক্লাসশুদ্ধ সবাই। তখন তো ক্লাসে একজন একটা চিঠি পেলে বত্রিশজন ঝুঁকে তা পড়তে শুরু করত। অর্ক অবশ্য চিঠি ছোড়েনি। ও সৌমিতার সঙ্গে বি.আর.এসের কাছে অঙ্ক করত। তখনই ঘনিষ্ঠতা। আমরা জানতাম, অর্ক পড়াশোনায় দারুণ। কিন্তু গরিব ঘরের ছেলে। মা নেই ওর। বাবার একটা দোকান আছে বাঘাযতীন স্টেশনের ধারে। ওদিকে সৌমিতা কোচিং আর স্কুলে যেত আসত গাড়িতে। নিত্যনতুন জামকাপড় পরত। তবু ওই বলে না, যার সাথে মজে মন...!

অর্ক সৌমিতার ছাড়াছাড়িও হয়ে গেছে তার প্রায় দশ বছর হল। সৌমিতা যখন দু-বার বসেও জয়েন্টে র‍্যাঙ্ক পেল না, তখন ওর ডাক্তার বাবা আর লেকচারার মায়ের টনক নড়ল। তখনই জানাজানি হল অর্কর ব্যাপারটা। সব দোষ পড়ল ওদের সম্পর্কের ওপর। গ্র্যাজুয়েশন করতে সৌমিতাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বর্ধমানের কোন এক কলেজে। সেখানে মাসির বাড়ি থেকে পড়াশোনা করল ও। অর্ককে বাড়ি ডেকে যাচ্ছেতাই অপমান করলেন সৌমিতার বাবা মা... 'বামন হয়ে চাঁদে হাত' —ইত্যাদিও নাকি বলেছিলেন। অর্ক কিন্তু প্রথমবারেই ইঞ্জিনিয়ারিং -এ ভালো চান্স পেয়ে গেছিল। ওদিকে সৌমিতার আর পড়াশোনায় মন বসল না। গ্রাজুয়েশনে কোনোক্রমে অনার্স ছিল, মাস্টার্সে চান্স পেল না। বাবা-মা এক নামজাদা উকিলের একমাত্র ছেলের সাথে সম্বন্ধ করলেন। বিয়ের আগে নাকি সৌমিতা বহুবার চেষ্টা করেছিল অর্কর সঙ্গে যোগাযোগ করার। কিন্তু অর্কদের তো ফোন ছিল না, তিন বছরে অন্তত দশটা চিঠি লিখেছিল সৌমিতা। জবাব আসেনি। বিয়ের জন্য ফিরেও জানতে পারে, অনেকদিন অর্করা ওদের পুরনো ভাড়াবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে দোকান বিক্রি করে দিয়ে হয়তো অপমানেই। সন্দীপ মানে সৌমিতার বর, খুবই

ভালো। অর্ককে ভুলতে বেশি সময় লাগেনি ওর।

এসব আমার মৌমিতার মুখে শোনা। গত দু-বছর ওর শ্বশুরবাড়ির নাড়িনক্ষত্র জানা হয়ে গেছে আমার। সন্দীপের পসার এখনও ততটা জমেনি, তাই খুব খাটতে হয় ওকে। সারাদিন বাড়িতে সময় কাটতে চায় না সৌমিতার। কাজের লোক অনেক, শুয়ে বসে, টিভি দেখে মোটা হয়ে যাচ্ছিল, তাই এই অফিসে জয়েন করে। ওর শ্বশুর মিস্টার সেনের পরিচিত। মাইনেটা পুরোটাই ওর যার পার্লারে, সিনেমায়, রেস্টোরেন্টে। আর বাকিটা জমছে। আমাকেও হামেশাই এটা-ওটা খাওয়ার। মানিব্যাগ খুলতেই দেয় না।

—'তোর কি মনে হয় শ্রীময়ী, অর্ক আমায় মনে রেখেছে?'

—'কেমন যেন শুকনো লাগল ওকে। মনে হল, যেন হামেশাই আসে ওদিকে।'

—'তাই? কী করে বুঝলি?' আমি ভ্রু কোঁচকাই।

—'না, মনে হল। দশবছর হয়ে গেল শেষ দেখা হয়েছে...অথচ এমনভাবে কথা বলল...যেন জানে আমি তারাতলায় থাকি, নিউ আলিপুরে অফিস করি...। আচ্ছা, তোর কি মনে হয়, ও আমার জন্য অপেক্ষা করে না তো! এখনও?'

ক্যান্টিনে লোক আসতে শুরু করেছে, আর বসা যায় না। আমরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে আসি। বিকেলের আলো মরে এসেছে। পার্কে ছুটোছুটি করছে বাচ্চারা।

—'তুই এমাসে ডাক্তারের কাছে গেছিলি?'

—'হ্যাঁ, গেছিলাম।'

—'কী বললেন?'

—'আরও কয়েকটা টেস্ট করতে বসেছেন। টেনশন করতে না করছেন।'

—'ঠিকই তো, টেনশন কিসের? তোর তো এখনও তিরিশ হয়নি। তাড়া নেই কোনো।'

—'আরে আমার বা সন্দীপের কোনো তাড়া নেই। শাশুড়ি পুরোনো দিনের মানুষ তো, খালি বলেছেন, ছ'বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও নাতি নাতনির মুখ দেখলাম না।'

—'কান দিস না তো।'

—'চল, আজ পিজা খাই।'

—'না রে, থাক।'

—'কেন?'

—'অন্য একদিন খাওয়াস। আজ ইডলি খেয়ে নিই চল।'

—'ধুস কোথায় দু'শো টাকার পিজা আর কোথায় পাঁচ টাকার ইডলি।'

—'থাক গে, বলছিল যখন। আর আজ মনটাও খুব খারাপ হয়ে আছে রে।'

—'অর্কর জন্য?'

—'হ্যাঁ। আচ্ছা শ্রীময়ী, তোর কি মনে হয়, অর্ক এখনও আমার ভালোবাসে?'

—'কেন বাসবে না? তুই তো আর ওকে অপমান করিসনি। তুই তো যোগাযোগ রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।'

—'হ্যা। আর দ্যাখ, বাবা মাও তো আমার ভালোর জন্যই করেছিল, তাই না? এই যে অর্ক, আজ দেখে তো মনে হল সেরকম কিছু এস্টাবলিশ করেনি। সব ইঞ্জিনিয়ার তো আর দারুণ চাকরি পায় না, তাই না?'

—'তা তো বটেই।'

—'কিন্তু এত ভালোবাসতাম ওকে...বিশ্বাস কর শ্রীময়ী, এত কষ্ট হল দেখে।'

—'যাক গে, খা তাড়াতাড়ি। দেরি করলে আবার দত্তদা গজগজ করবে।'

ফিরে আসার পরেও সৌমিতা কাজে তেমন মন দিল না। আমাদের অফিসের মাইনের একটা বড় অংশ নির্ভর করে প্রোডাকশনের ওপর। তাই সবাই নাক মুখ গুঁজে খেটে চলে। অবশ্য সৌমিতার অত টাকার প্রয়োজন নেই।

বেরোবার সময় রোজই আমায় লিফট দেয় সৌমিতা। তারাতলার মোড় অবধি। ওখান থেকে ও বাঁদিকে বেঁকে যায়, আর আমি বাস ধরি বেহালার জন্য। আজ গাড়িতেও শুধু অর্করই কথা। অবশ্য ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে।

—'কি জানি, কতদিন এভাবে দাঁড়ায় ও, হয়তো আমায় একবার চোখের দেখা দেখতে!'

—'হতে পারে।'

—'বিয়ে করেনি বোধহয়, বল?'

—'তোর সাথে তুলনা করে মেয়ে পায়নি বোধহয়।'

—'কি মাথা ছিল অঙ্কে। কীভাবে নষ্ট করেছে নিজেকে।'

—'তাই তো!'

নামার সময় এর হাতটা ধরি। 'ভাবিস না সৌমিতা, তোর তো কোনো দোষ ছিল না, বাবা মায়েরা আমাদের ভালোর জন্যই একটু কঠোর হন কখনো কখনো।'

সৌমিতাও আমার হাতটা চেপে ধরে। ওর চোখে জল চিকচিক করছে। 'এরপর পাগলটার সঙ্গে দেখা হলে বলে দেব, আর যেন এমন না করে, এবার একটা বিয়ে-থা করে যেন সংসারী হয়।'

—'অবশ্যই বলিস।'

সৌমিতার গাড়ি বেঁকে যায়। আমি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছি। গাড়িতে এসি ছিল, তাও ঘেমে গেছি। সৌমিতাকে এখনও বলে উঠতে পারিনি, তিন মাস চলছে আমার। ডাক্তার দাশগুপ্ত পিজা টিজা জাতীয় ফার্স্টফুড কম কেতে বলেছেন।

জি-ব্লকেই চেম্বার ওনার। অফিস যাওয়ার আগে আমায় ওঁর কাছেই চেকআপে নিয়ে এসেছিল অর্ক।